

# ବିଦର୍ଶନ ସାଧନା

( ଧ୍ୟାନଯୋଗ )

ଶ୍ରୀ ଶୀଳାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ



## কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে।

ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান

বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান

ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা

সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায়

ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

# বিশদর্শন-সাম্রাজ্য

( ধ্যানযোগ )

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

: পরিবেশক :

মহাবোধি বুক এজেন্সী  
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট  
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :

তপনকুমার ব্রহ্মচারী

২য় সংস্করণ, ১৯৯৭ ইং

মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাষ্ট বোর্ড,

সংগীতি

পি ৬৮, বোস নগর

মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগণা,

পশ্চিমবঙ্গ

মুদ্রক :

জাগরণী প্রেস

৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,

কলিকাতা-৭০০০১২

দাম— সাত টাকা মাত্র

## নিবেদন

নির্বাণোপলব্ধিই বৌদ্ধ ধ্যান সাধনার চরম লক্ষ্য। লক্ষ্য পথে অগ্রসর হবার সময়েই এ ধ্যান সাধনা সাধকের জীবনে দুঃখের ভার লাঘব করে, মনকে শাস্ত করে এবং অনিত্যতার একটি গভীর অনুভূতি মনে জাগিয়ে দেয়। তখন সংসারে আসা যাওয়ার খেলার প্রতি মনের বিরাগভাব বর্ধিত হয়।

ধ্যানের মূল কথা হচ্ছে মনের একাগ্রতা। আমাদের মনের দুইটি অংশ আছে—মনের গোপনতল স্থির, শাস্ত, ওপরের স্তর সদা বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল। মনের বিক্ষুব্ধতাবের কারণ হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংস্পর্শ। কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুটিয়ে ফেলে, তেমনি বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারলে অন্তরের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। এ প্রতিনিবৃত্তি অসম্ভব মনে হলেও যোগ সাধনার ফলে সম্ভব হয়ে ওঠে। যোগীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ। যোগ সাধনায় মনের একাগ্রতা বর্ধিত হ'লে মন নিবাত দীপ শিখার মত স্থির অচঞ্চল হয়। যদিও সাহিত্যিক, শিল্পী ও বিজ্ঞানী প্রভৃতির একাগ্রতার শক্তি পরিলক্ষিত হয়, তবুও তা মনের শান্তি অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে অধ্যাত্ম চর্চার একাগ্রতা ও বুদ্ধিজাত একাগ্রতার তফাৎ কোথায়? অধ্যাত্ম একাগ্রতা আসে যৌগিক ক্রিয়ার ফলশ্রুতিরূপে এবং হিংসা দ্বেষ লোভ আকাঙ্ক্ষায় তা কলুষিত হয় না। এ একাগ্রতার লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের জগৎ থেকে অতীন্দ্রিয় জগৎ পানে যাত্রা। এ বিষয়টি পরিষ্কৃত করার চেষ্টা হয়েছে এ নিবন্ধে বিদর্শন ধ্যান পদ্ধতি অবলম্বনে।

ব্রহ্মদেশের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মাননীয় উমু এর আমন্ত্রণে অনাগারিক মুনীন্দ্রজীপ্রমুখ আমরা যখন ১৯৭৫ সালে ব্রহ্মদেশে গমন করি, তখন তথাকার প্রখ্যাত মহাসি সেয়াডো প্রমুখ মহাযোগীদের একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়। তাঁদের উজ্জ্বল আলোচনার আলোকে পালি বৌদ্ধ শাস্ত্র ও আধুনিক বৌদ্ধ রচনাসমূহ পর্যালোচনা করে এ নিবন্ধ সংকলিত। যাঁদের জন্ত এ বই রচিত, সে সাধনেচ্ছু পাঠকবর্গের কিকিৎ উপকার হলে শ্রম সার্থক মনে করব।

এর প্রকাশের ব্যাপারে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য লাভ করেছি, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধগয়ার ব্রহ্মচারী জীবানন্দ ও মুহুদ শ্রীফণী কুমার দে প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত আত্রেয়ী মজুমদার সহৃদয়তার সঙ্গে এর প্রুফ সংশোধন করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী।

রাশিয়ান উপাসিকা শ্রীমতী জারা নোভিকফ অনাবিল শ্রদ্ধার সঙ্গে এ নিবন্ধ প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেছেন। তাঁর অকৃত্রিম শুভাকাজক্ষা কোন প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না। তবু এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। ইতি—

সংগীতি  
মধ্যমগ্রাম  
বৈশাখী পূর্ণিমা  
১৩৭৭

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

## বিদর্শন-সাধনা

এক

অর্থ, যশ, মান-সম্মান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যতই জীবনে আশুক না কেন মানুষের পাওয়ার আশা মিটে না। অপরিতৃপ্তির সুরই অন্তরে নিরন্তর ধ্বনিত হয়। আকাজক্ষা-ক্ষুব্ধ চঞ্চল মনে শান্তি কোথায়? অতৃপ্তির হাহাকারের মধ্যেই জীবনের দিনগুলো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। জাগতিক বস্তুর ক্ষয়িষ্ণুতা, নশ্বরতা চিরদিন চিস্তাশীল বিজ্ঞের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। এজন্ম সংসার খেলাকে জল বুদ্ধদের মত সারহীন মনে হলেও জীবনকে তাঁর অর্থহীন স্বপ্ন বলে মনে হয়নি। তাই জীবনকে হেলায় খেলায় কাটিয়ে না দিয়ে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের কথা তাঁকে চিস্তামগ্ন করেছে। এর মর্মকোষে যে গভীর সত্য নিহিত আছে, তার সন্ধানে আত্মোৎসর্গ করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। এতাদৃশ সন্ধান বার্থতায় পর্যবসিত না হয়ে তাঁর সম্মুখে আলোকের স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটন করেছে। সে আলোয় উদ্বুদ্ধ সন্ধানী নির্ভয়ে অগ্রসর হয়েছেন নতুন জগতের পানে, পৃথিবীর বন্ধন ফ্রন্দন তাঁর গতিরোধ করেনি।

সেই অন্তর্নিহিত সত্যের হাতছানিই একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থকে রাজৈশ্বর্যের ক্রোড় থেকে স্থাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করে সেখানে সাধনায় রত হয়েছিলেন। সে যুগের উচ্চতম ধ্যান পদ্ধতি থেকে খেচুরীমূত্র পর্য্যন্ত কোনটিই তাঁর সাধনায় বাদ পড়েনি। এর মাধ্যমে যে অধ্যাত্ম সিদ্ধি তাঁর লাভ হয়েছিল, তা তাঁর উর্ধ্বগ উন্নতিশীল মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। অবশেষে সাধনার ক্ষেত্রে নতুন পন্থা অবলম্বন করে গয়ার বোধিদ্রুম মূলে সন্ধানের চরম শিখরে অধিরোহন করে তিনি পরম সম্বোধি লাভ করেছিলেন। সেই থেকে জীবনের

শেষ দিন পর্য্যন্ত যোগ্য পাত্র অন্বেষণ করে অকুপণ ভাবে সাধনার সে গুঢ় মন্ত্র দান করতে থাকেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু সন্ধানী জীবনে সত্যোপলব্ধি করেন। সেই উজ্জল সাধনার ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনজীবনে প্রবর্তিত হয় এবং পথের নির্দেশ দেয়। এখনো তা বৌদ্ধ যোগীদের জীবনে জীবন্ত হয়ে আছে। এ বিশিষ্ট সাধনা পদ্ধতি ‘ভাবনা’ নামে অভিহিত। সমাধি ও বিদর্শন এর দুইটি শাখা।

সমাধি শব্দের অর্থ হচ্ছে মনের একাগ্রতা। অবলম্বিত ধ্যান বিষয়ে মনের একাগ্রতা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত্ব করে ক্রমে ক্রমে ধ্যানের বিভিন্ন স্তরে উপনীত হওয়া সমাধি-ভাবনার মূল উদ্দেশ্য।

‘বিপস্সনা’ বা বিদর্শন সম্পূর্ণ বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে বিশেষভাবে দর্শন বা অন্তর্দৃষ্টি। এর মূলেও রয়েছে একাগ্রতা। কারণ একাগ্রতা আয়ত্ত্ব না হলে বিদর্শন অভ্যাস সম্ভব নয়। সহজ কথায় একাগ্র চিন্তে দেহমনের সূক্ষ্মতম পর্যবেক্ষণে বা অবহিত ভাবে দেহ মনের ক্রিয়া অনুধাবনে সত্যোপলব্ধি এ ভাবনার লক্ষ্য। এ জ্ঞান একে বলা হয় লোকোত্তর সাধনা। বিদর্শন ভাবনাই এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বলা বাহুল্য, সাধন-মার্গের প্রথম সোপান হচ্ছে শীল। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলা হয়েছে “কোটি আদি কুসলানং ধম্মানং? সীলঞ্চ পরিসুদ্ধং।” অর্থাৎ সুবিশুদ্ধ শীল বা শুদ্ধ চরিত্রই কুশল ধর্মের মূল। বস্তুতঃ চারিত্রিক শুদ্ধতাই ধর্মচর্চার ভিত্তি। চরিত্র শুদ্ধ, সুন্দর না হলে অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয় না। পতিত জমি আবাদ করে সোনার ফসল ফলাতে হলে যেমন প্রথমেই আগাছা তুলে ফেলতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের জ্ঞান সর্বাগ্রে দুঃশীলতা, হুর্নীতি বিদূরিত করে চরিত্র শোধন আবশ্যক।



শীলের বিশ্লেষণে দেখা যায়, শীলন বা অমুশীলন অথবা অভ্যাসই তার প্রকৃতি। 'চারিত্ত' 'বারিত্ত' রূপে তার দুইটি ভাগ দেখানো হয়েছে। যা করণীয় বা কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে, তাকে বলা হয় 'চারিত্ত' এবং যা (প্রাণিহত্যা করবে না, চুরি করবে না ইত্যাদি) নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, তাকে বলা হয় 'বারিত্ত'। এ দুইটিকে আমরা বিধিনিষেধ বলে ধরে নিতে পারি। তারতম্য ভেদে শীল হয় হীন, মধ্যম এবং উত্তম। নাম যশের জন্ম, সম্মান প্রতিপত্তির জন্ম গৃহীত শীলকে হীন শীল বলা হয়। শীল পালনের অহঙ্কারে ক্ষীত ব্যক্তির শীলও হীন শীল। তাঁর শীল আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দায় ক্লিষ্ট হয়ে থাকে। পুণ্যফলের আশায় অথবা শুধু আত্মমুক্তির জন্ম পালিত শীল মধ্যম শীল। সমগ্র বিশ্বের প্রতি করুণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্কামভাবে পালিত অমলিন লোকোত্তর শীলই উত্তম শীল। অবনতি স্থিতি ইত্যাদি ভেদে শীল চারি প্রকার। তা নিম্নোক্ত শ্লোকে স্পষ্ট :—

যোচ সেবতি দুস্সীলে সীলবন্তে ন সেবতি  
বথু বীতিক্কমে দোসং ন পস্সতি অবিদম্মু,  
মিচ্ছা সংকপ্প বহুলো ইন্দিয়ানি ন রক্কথতি  
এবরুপস্স বে সীলং জায়তে হীনভাগিযং ।  
যো পনন্তমনো হোতি সীল সম্পত্তিয়া ইধ  
কম্মট্ঠানানুযোগস্মিং ন উপ্পাদেতি মানসং,  
তুট্ঠস্স সীলমন্তেন অঘটন্তস্স উত্তরিং  
তস্স তং ঠিতি ভাগীযং সীলং ভবতি ভিক্কুনো ।  
সম্পন্নসীলো ঘটতি সমাধথায় যো পন  
বিস্সেভাগিযং সীলং হোতি এতস্স ভিক্কুনো ।  
অতুট্ঠো সীল মন্তেন নিব্বিদং যোন্সুজ্জতি  
হোতি নিব্বেদ ভাগীযং সীলমেতস্স ভিক্কুনো ।

অর্থাৎ যে অজ্ঞ ব্যক্তি দুঃশীল ব্যক্তিদের সঙ্গ করে, শীলবান বা সুচরিত্র ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভ করে না, নিয়মভঙ্গে দোষ দেখে না এবং মিথ্যা সংকল্পানুগ হয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে না, সে ব্যক্তির শীলের অবনতি অবশ্যস্বাবী।

যে ভিক্ষু আপনার শীল সম্পদেই তুষ্ট থাকেন এবং যোগ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন না, শুধু শীলে তুষ্ট, সেই ভিক্ষুর শীল উত্তরোত্তর চেষ্টার অভাবে স্থিতিশীলই হয়।

যে শীলসমৃদ্ধ ভিক্ষু সমাধির জ্ঞান সচেষ্ট হন, সেই ভিক্ষুর শীল হয় উন্নতিশীল।

যে ভিক্ষু শুধু শীলে তুষ্ট না হয়ে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জ্ঞান সতত উত্তমশীল হন, সেই ভিক্ষুর শীল হয় নির্বাণপ্রবণ।

## দুই

যথাগৃহীত শীল যখন পূর্ণ হয়, তখন চরিত্রের নির্মলতা মনের মধ্যে বয়ে আনে আনন্দ, মনের গতি হয় সহজ সরল। এরকম মন অধ্যাত্ম-সাধনার উপযোগী হয়। তাই শীল পালনে মনকে শুদ্ধ সরল করে তুলতে হবে বিদর্শন ভাবনার জ্ঞান। ভাবনার আরম্ভে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লাভের স্বপ্নে বিভোর হওয়া বিধেয় নয়। ‘শীলই এর সুফল লাভ হবে অথবা সাধনায় সাফল্য লাভে জীবন সার্থক হবে’

এরকম চিন্তা মনে পোষণ করা উচিত নয়। ফলের আশায় মনকে বিড়স্থিত না করে ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিয়ে শুদ্ধ শাস্ত্র মনে বিদর্শন প্রশালী অভ্যাস করতে হয়।

নির্জন স্থানে, অনুকূল পরিবেশে, দেহকে সোজা সরল রেখে ভাবনার জগৎ বসতে হয়। পদ্মাসন এর জগৎ বিশেষ অনুকূল। যিনি পদ্মাসনে বসতে অসমর্থ, তাঁর পক্ষে উপযোগী সূখাসনে বসা উচিত, যাতে আলস্য, নিদ্রা, বিঘ্ন না ঘটায়। ধ্যানাসনে পোষাক এমন ভাবে পরা উচিত যাতে দেহের কোন অংশের রক্ত চলাচল ব্যাহত না হয় এবং তাঁর মিতাহারী হওয়া উচিত।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, দেহ মনের সকল ক্রিয়াকে নিবিষ্ট মনে অনুধাবন বা দেহ মনের ক্রিয়ার ওপর স্মৃতি জাগ্রত রাখা বা মনোনিবেশ করা বিদর্শন ভাবনার মূল কথা। গোড়াতেই দেহ মনের সকল ক্রিয়া অনুধাবন করা বা এ সম্বন্ধে সজাগ থাকা সহজ সাধ্য নয়। এজগৎ প্রথমত গমন, স্থিতি, উপবেশন, শয়ন, এ চারি ঈর্ষাপথ নিয়ে স্মৃতিচর্চা বা মনোনিবেশ শুরু করতে হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে এ স্মৃতিচর্চা প্রসারিত করা হয় অগ্ন্যাগ্ন্য দৈহিক ক্রিয়ার দিকে যথা, বস্ত্র পরিধান, ধোবন, আহার, পান ইত্যাদি। প্রত্যেক দৈহিক ক্রিয়ায় অর্থাৎ গমন, স্থিতি, উপবেশন, শয়ন, আহার, স্নান ইত্যাদিতে মন সে সে ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন সজাগ থাকবে। কোন ক্রিয়াই সাধকের স্মৃতি বহির্ভূত বা চেতনা বিযুক্ত থাকবে না। এভাবে স্মৃতি অভ্যাস করতে করতে সাধক ধ্যানাসনে বসেন। বসার পূর্বে, বসার ইচ্ছা সম্বন্ধে তিনি সচেতন থাকেন। আসনের সঙ্গে দেহাংশের স্পর্শ ও বসা সম্বন্ধেও তিনি সজাগ রহেন। অতঃপর শ্বাস-প্রশ্বাসে উদরের যে ওঠানামা চলতে থাকে তার ওপর সাধক মন নিবদ্ধ করেন। ওঠানামার প্রত্যেক অবস্থায় মন অবহিত

থাকবে। কিন্তু উদরের এ ওঠানামার সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তা উচিত নয়। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে ওঠানামার ওপর। যতক্ষণ সম্ভব একটানা এ মনোনিবেশ চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার্থীর পক্ষে গোড়ার দিকে উদরের ওঠানামা কখনো কখনো অস্পষ্ট থাকে। আবার অল্পক্ষণের জ্ঞানই স্পষ্ট হয়। কিন্তু এজ্ঞান চিন্তার কোন কারণ নেই। নিয়মিত অভ্যাসের ফলে এ অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়। অস্পষ্ট হলে উদরের ওপর হাত রেখে ওঠানামা অনুভব করা যায়। পরে হাত সরিয়ে নিলেও ওঠানামা স্পষ্ট থাকে। যদি সুবিধাজনক মনে হয়, কেউ শুয়ে শুয়েও উদরের ওঠানামার ওপর মন নিবদ্ধ রাখতে পারেন, কিন্তু আলস্য, তন্দ্রা যেন প্রশ্রয় না পায়। তবে আসনে বসেই ধ্যানাভ্যাস বিধেয়। যখনি উদরের ওঠানামা অস্পষ্ট হয়, তখনি ওঠানামাকে অনুভব করার চেষ্টা না করে পূর্বোক্ত স্পর্শ ও বসা সম্বন্ধে মন অবহিত রাখা কর্তব্য। আবার যখন উদরের গতি অনুভূত হয়, তখন আবার তার ওঠানামার ওপর মন রাখা বাঞ্ছনীয়। একথা জানা উচিত—মনোনিবেশের বিষয় হচ্ছে এখানে সংশ্লিষ্ট অনুভব।

অনেক্ষণ বসার দরুণ যদি ক্লান্তি আসে, পা ঝিম ঝিম করে, কিংবা ব্যথা করে, তাহলে এ ক্লান্ত্যভাব, পা ঝিম ঝিমনি বা ব্যথার অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। যতক্ষণ এরকম অনুভূতি থাকে, ততক্ষণ তা নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করতে হবে। এভাবে সজাগ হয়ে ক্রমাগত লক্ষ্য করায় কখনো কখনো ক্লান্তি, ঝিম ঝিমনি ও ব্যথা বিদূরিত হয়। যদি সজাগ থাকা সম্বন্ধে এগুলো অন্তর্ভুক্ত না হয়ে ধ্যানাভ্যাসের বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে অবস্থান পরিবর্তন আবশ্যক অর্থাৎ আসন ত্যাগ করে পায়চারি করতে হবে এবং প্রথমে পায়চারির ইচ্ছাকে লক্ষ্য করতে হবে এবং পরে পায়চারি আরম্ভের

প্রত্যেক ক্রিয়ায় সজাগ হবে। এভাবে অবহিত চিন্তে পায়চারি আরম্ভ করে প্রতি পদক্ষেপের প্রত্যেক অবস্থায় মন নিবদ্ধ করে চলতে হবে। পা তোলা, পা বাড়ানো ও পা রাখা—প্রতি পদক্ষেপের প্রত্যেক অবস্থায় সজাগ হয়ে পায়চারি করতে হবে। যদি একটু তাড়াতাড়ি চলার প্রয়োজন হয়, তাহলে পা তোলা ও পা রাখা এ দুই ক্রিয়ায় মন নিবদ্ধ করতে হবে। সজাগ হয়ে পায়চারির অভ্যাস, মনের একাগ্রতার জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী। একে ধ্যানাভ্যাসের পস্থা হিসাবে গ্রহণ করলে এর জন্য দীর্ঘ প্রাঙ্গন, লম্বা বারান্দা কিংবা উন্মুক্ত স্থান প্রয়োজন, যাতে তাড়াতাড়ি ফিরতে না হয়। তাড়াতাড়ি ফিরতে হলে মনোনিবেশের ব্যাঘাত ঘটে। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ ধরে এ ভাবে পায়চারি করা আবশ্যিক।

ধ্যানাভ্যাসের সময় যদি মনে অসংগত চিন্তার উদয় হয়, তখনি অবহিত হয়ে ধ্যানভঙ্গ লক্ষ্য করা উচিত এবং মনকে ধ্যানের বিষয়ে ফিরিয়ে আনা বিধেয়। এতাদৃশ সতর্কতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সতর্কতা যতই বর্ধিত হবে ততই ধ্যানভঙ্গের মাত্রা হ্রাস পাবে। এতে মনের একাগ্রতা ও শাস্ত্যভাব নিবিড় হবে। ধ্যানভঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি অবলম্বনে নৈপুণ্য আয়ত্ত হলে, আত্মসংযম দৃঢ় হয় এবং রিপুদমন সহজ হয়ে ওঠে।

অবাপ্তিত চিন্তার উদয়ে বার বার ধ্যানভঙ্গ হলে উত্যক্ত, বিরক্ত ও হতাশ হওয়া উচিত নয়। বরং সজাগ হয়ে সে চিন্তাকে লক্ষ্য করতে হবে। যেহেতু, কাম-ক্রোধাদি আবিল ভাবগুলোর উদয় সাধারণ মানুষের মনে অবশ্যম্ভাবী, তাই অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এগুলোর মোকাবিলা করতে হবে, এগুলোর উৎপত্তিতে সজাগ সচেতন হয়ে। এ মোকাবিলার অর্থ হচ্ছে আবিল ভাবগুলোর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে সেগুলোকে লক্ষ্য করা। বাইরের বাধা উপস্থিত হলেও

এ উপায় অবলম্বন করতে হয়। ধরুন, ধ্যানাভ্যাসের সময় বিরক্তিকর আওয়াজ কানে আসে। একে ‘শব্দ’ বলে লক্ষ্য করতে হবে। লক্ষ্য করা সত্ত্বেও যদি এর জন্ত মনে বিরক্তি আসে, তাহলে এ বিরক্তি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ধ্যানের বিষয়ে মনকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এতে অপারগ হলে আবার চেষ্টা করতে হবে। যদি আওয়াজ বড় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, যতক্ষণ আওয়াজ মিলিয়ে না যায়, ততক্ষণ আওয়াজকে ধ্যানের বিষয় করে (আওয়াজের ওপর মন নিবদ্ধ করে) ধ্যান চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে ধ্যানের বাধাকে ধ্যানের বিষয়ে রূপান্তরিত করা যায়।

যা হোক, যখন মন বাধামুক্ত শান্ত হয়, তখন আগের ধ্যান বিষয়ে মনকে ফিরিয়ে আনা কর্তব্য। এর নিরন্তর অভ্যাসে সাধনার পথ স্মুগম হয়।

শিক্ষানবীশের পক্ষে দিনে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা থেকে চারি ঘণ্টা পর্যন্ত বিরতিহীন ধ্যানাভ্যাস বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এ সময়টুকু যথেষ্ট বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। তবে গমনে, স্থিতিতে, শয়নে, উপবেশনে, আহার, পানাদিতে সজাগ সচেতন হবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে বা স্মৃতির সূত্রকে ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

এভাবে ধ্যানের অনুশীলন উত্তরোত্তর মনের একাগ্রতা বয়ে আনে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মন অনাবিল না হয়, ততদিন পর্যন্ত সাধনার অন্তরালে রিপুসমূহ সময় সময় মন অধিকার করে বসে। সাধক এগুলোকে প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজী নন। যখন রিপুর উদয় হয়, তখনই তিনি আত্মসচেতন হয়ে তাকে লক্ষ্য করেন। লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রশ্রয় না পেয়ে মিলিয়ে যায়। মন ধ্যানের বিষয়ে ফিরে আসে। কখনো কখনো তিনি রিপুর উদয় বিলম্বে টের পান। তবে টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আত্মস্থ

হয়ে ধ্যানপন্থা অনুসরণ করেন। বস্তুতঃ, অনুশীলনকারী সাধকের আয়ত্ত কণিক-সমাধি অতি নবীন ও অপ্রবল বলে রিপুসমূহ কখনো কখনো তাঁর সাধনাচিন্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এজন্য এগুলোকে চিন্তের নীবরণ বা পরিপন্থ বলা হয়।

নিরন্তর সাধনায় চিন্তের একাগ্রতা বাড়তে থাকে এবং কণিক সমাধি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ সময় সাধকের সাধনার এক নব দিগন্ত সূচিত হয়। তখন ধ্যানের বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর চিন্ত পূর্ণভাবে সমাহিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রায়ই মনের চাঞ্চল্য থাকে না অর্থাৎ মনে কাম, ক্রোধ ইত্যাদির উৎপত্তি বিরল হয়। যদিও কখনো কখনো ব্যতিক্রম ঘটে, চাঞ্চল্য সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই যোগী যথাযথভাবে তা লক্ষ্য করতে পারেন। এভাবে আত্মসচেতন হবার ফলে রিপুসমূহ মনে স্থান খুঁজে পায় না। তখন তাঁর মন হয় শুদ্ধ, অমলিন। এতাদৃশ শুভ্র, সুন্দর মন, ধ্যানের বিষয়ে সহজ ভাবে মগ্ন হওয়ায় বিদর্শন চিন্তের ক্ষণ-স্থিতি বলে কথিত সমাধি নিরন্তর প্রবর্তিত হতে থাকে। একে বলা হয় চিন্ত-বিশুদ্ধি। এর স্থিতিকাল পরিমিত হলেও ধ্যানের বিষয়ে নিরন্তর এক ভাবে প্রবর্তিত হয় বলে রিপুসমূহ তাঁকে অভিভূত করতে পারে না।

## ভিন

মোটামুটিভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে, দেহমনের সকল ক্রিয়াকে অনুধাবন বা দেহমনের ক্রিয়ার ওপর স্মৃতি জাগ্রত রাখাই বিদর্শন। বৌদ্ধ পরিভাষায় বলতে গেলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় (ত্বক) ও মন এ ছয় দ্বারে প্রকট নামরূপের পর্যবেক্ষণই বিদর্শন। নাম বলতে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ চারি স্বক্ক এবং রূপ বলতে রূপস্বক্কেই বোঝায়। স্বক্ক শব্দের অর্থ হচ্ছে, রাশি বা সমষ্টি। আমাদের অস্তিত্ব বিশ্লেষণে আমরা পাই (১) রূপরশি (২) বেদনারশি (৩) সংজ্ঞারশি (৪) সংস্কাররশি (৫) বিজ্ঞানরশি। এ পাঁচটির সমবায়ে জীবের জীবনপ্রবাহ প্রবর্তিত।

---

- (১) রূপ—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারি ভূত এবং এগুলোর সমবায়ে উৎপন্ন বস্তুকে সাধারণতঃ রূপ বলা হয়। বৌদ্ধ দর্শনে আকাশ ও ব্যোম, ভূত বা জাত নয় বলে, ভূত বলে স্বীকৃত হয়নি। এজন্ত পঞ্চ ভূতের স্থলে চতুর্ভূতই উক্ত হয়েছে।
- (২) বেদনা—চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ছয় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয় সমূহের রসানুভূতিই বেদনা। সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা বা সৌম্য, সৌমনস্ত ও দৌর্মনস্ত ভেদে বেদনা পাঁচ প্রকার।
- (৩) সংজ্ঞা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারে পতিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিষয় সম্বন্ধে যে প্রথম প্রতীতি হয়, তাকে বলা হয় সংজ্ঞা। এ দ্বারা গোচরীভূত বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় মাত্রই হয় এবং বিষয় বিষয়ান্তরের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়।



প্রথমতঃ ছয় দ্বারে প্রকট নামরূপের বিদর্শন সহজসাধ্য নয় বলে গমন, স্থিতি, উপবেশন, শয়ন ইত্যাদি শুধু দৈহিক ক্রিয়া অনুধাবনে রূপকে কেন্দ্র করে বিদর্শন সাধনার আরম্ভের কথা বলা হয়েছে। এতে স্নান সাধক পূর্বোক্ত ভাবে অধিকার লাভ করেন, তখন তিনি ক্রমশঃ অগ্ন্যাগ্নি ইন্দ্রিয়দ্বারে আবির্ভূত নামরূপের পর্যবেক্ষণে রত হন এবং সহজেই তাতে সাফল্য লাভ করেন। তখন তাঁর ক্ষণিক-সমাধি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এভাবে পূর্বোক্ত চিত্তবিশুদ্ধি আয়ত্ত হলে সাধক অবহিত চিত্তে নামরূপ বিশ্লেষণ করতে থাকেন। বিশ্লেষণে তিনি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারেন - 'নাম' বলে উক্ত বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ চারি স্বক, রূপস্বককে আশ্রয় করেই প্রবর্তিত, আবার নাম ব্যতীত রূপ অচেতন পদার্থ মাত্র। অতএব এরা পরস্পরাশ্রিত তাই উক্ত হয়েছে—

যথাপি নাবং নিস্মাষ মনুস্মা যন্তি অন্নবে  
এবমেব রূপং নিস্মাষ নামকাযো পবন্ততি ।  
যথাচ মনুস্মে নিস্মাষ নাবা গচ্ছন্তি অন্নবে  
এবমেব নামং নিস্মায রূপকাযো পবন্ততি ।  
উভো নিস্মায গচ্ছন্তি মনুস্মা নাবা চ অন্নবে  
এবং নামঞ্চ রূপঞ্চ উভো অঞ্ঞোঞ—নিস্মিতা ।

(৪) সংস্কার—বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত যাবতীয় চিত্ত বৃত্তিকে সংস্কার বলে ।

(৫) বিজ্ঞান—চিত্ত বা মনকে বিজ্ঞান বলে । চিত্তবৃত্তিযোগে উৎপন্ন বিভিন্ন লৌকিক চিত্তসমূহ বিজ্ঞানস্বক নামে অভিহিত হয় ।

অর্থাৎ যেমন তরী অবলম্বনে মানুষ সমুদ্র যাত্রা করে, তেমনি ‘রূপ’ অবলম্বনে ‘নাম’ প্রবর্তিত হয়। আবার যেমন তরীর সমুদ্রে চলা নির্ভর করে মানুষের সহায়তার ওপর, তেমনি রূপের প্রবর্তন সম্ভব হয় ‘নাম’ এর সহায়তায়। অতএব ‘নাম’ ও ‘রূপ’ পরস্পরাশ্রয়ী অর্থাৎ পরস্পরের সহযোগিতায় প্রবর্তিত হয়।

স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে, একটির উৎপত্তিতে অপরটির উৎপত্তি এবং একটির বিলয়ে অপরটির বিলয় ঘটে। এগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে শুধু নামরূপের বা পঞ্চ স্বক্কেরই লীলা প্রতিভাত হয় এবং এর মধ্যে কোথাও ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অক্ষ, চক্র ইত্যাদির সমবায়ে যেমন রথ আকার গ্রহণ করে, তেমনি নাম ও রূপের সমবায়ে ব্যবহারিক ভাবে ব্যক্তি প্রকাশ পায়। নাম রূপের বিশ্লেষণে সাধকের প্রতিভাত হয়—গমন, স্থিতি, উপবেশন, শরীরের উন্নমন-অবনমন ইত্যাদি ভৌতিক বা দৈহিক ক্রিয়াসমূহ বিভিন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানও এক নয়। এ ভাবে সমগ্র নামরূপের ক্রিয়ার বিশ্লেষণ চলতে থাকে।

গোড়াতে যোগাভ্যাসের সময় গমন, স্থিতি, উপবেশন ইত্যাদি দৈহিক ক্রিয়ায় ‘আমি চলছি’ ‘আমি দাঁড়িয়েছি’ ‘আমি বসছি’ ‘আমি আনত হচ্ছি’ এ ভাবে সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে ‘আমি’ ‘আমার’ ধারণা বা অহং ভাব জেগে উঠত। নামরূপ বিশ্লেষণের ফলে এরকম ‘আমি’ ‘আমার’ ধারণার নিরসন হয়। তখন দৃশ্য বস্তু দেখে তাঁর মনে হয়—চক্ষু, দৃশ্যবস্তু, দর্শন এবং অবগতি বিভিন্ন। শব্দ শুনে কর্ণ, শব্দ, শ্রবণ এবং অবগতিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করেন। এ ভাবে অণ্ণাণ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদিতে বিশ্লেষণ জ্ঞান হয়। এই সময় ‘নাম’ বলে কথিত চিন্তা ও চিন্তাবৃত্তি সমূহের বিষয়াভিমুখে গমন ও নতি এবং রূপ বলে উক্ত

গৌতিক বস্তুসমূহের বিষয়াভিমুখে অগমন তিনি প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিশ্লেষণ করে হৃদয়ঙ্গম করেন। একেই বলে নামরূপ-বিশ্লেষণ জ্ঞান।

এ নামরূপ বিশ্লেষণে জ্ঞান পরিপক্ব হলে সাধকের প্রতীতি হয়—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে শরীরের যে ওঠা নামা হয়, তা এবং তার সম্বন্ধে জ্ঞান—এ দুইটি ব্যতীত অন্য কিছু এতে নেই। এভাবে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে দৈহিক ক্রিয়া ও তার জ্ঞান এ দুইটিকে তিনি দেখতে পান। এ দুইটিকে অবলম্বন করে ‘আমি’ ‘তুমি’ ‘সে’ ‘স্ত্রী-পুরুষ’ বলে কোন ব্যক্তি-বিশেষের ধারণা তাঁর জাগে না। এক কথায়, তিনি নাম রূপের সমস্ত ক্রিয়ায় নামরূপকেই দেখতে পান। একে বলা হয় দৃষ্টিবিশুদ্ধি।

## চার

দৃষ্টিবিশুদ্ধি যখন পরিপক্ব হয়, তখন নামরূপের হেতু প্রকট হয়। প্রথমতঃ চিন্তাই রূপের হেতু বলে প্রকাশ পায়। কারণ, হস্ত পদ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে চিন্তাই কর্তৃত্ব করে। সুতরাং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের হেতু চিন্তাই। সাধক প্রথমতঃ এগুলো পর্যবেক্ষণ করে হৃদয়ঙ্গম করেন—সংকোচনেচ্ছু চিন্তা উৎপন্ন হলে হস্ত পদ ইত্যাদির সংকোচন রূপ ভৌতিক ক্রিয়া দেখা দেয় এবং প্রসারণেচ্ছু চিন্তা উন্নত হলে প্রসারণরূপ ভৌতিক ক্রিয়া দেখা যায়। এ ভাবে তিনি সকল ভৌতিক ক্রিয়ার হেতু অনুসরণ

করতে থাকেন। এর পর তিনি নামের হেতু হৃদয়ঙ্গম করেন। মন যখন বাইরের দিকে চলতে চায়, তখন তার অনুকূল সংকল্প-চিন্তা উৎপন্ন হয়। এর ওপর লক্ষ্য না রাখলে মন বহির্মুখী হয়ে চলে এবং লক্ষ্য রেখে সতর্ক হলে মন বহির্মুখী হতে পারে না। এভাবে চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে রূপ, শব্দাদি বিষয়ের সংযোগে দর্শন শ্রবণাদির জ্ঞান যে চিন্তা উৎপন্ন হয়, তা তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। তখন প্রায়ই সাধকের শরীরে নানারকম ছুঃখানুভূতি জাগে। সেগুলোর মধ্যে এক অনুভূতিকে লক্ষ্য করলে আর এক অনুভূতি অশ্রুত অনুভূত হয়; একেও লক্ষ্য করলে অপরত অশ্রুত অনুভূতির উদ্ভব হয়। তিনি এভাবে উৎপন্ন অনুভূতিকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন এবং পর্যবেক্ষণের সময় এ অনুভূতিসমূহের উৎপত্তি বলে কথিত আদি ভাগ মাত্র বুঝতে পারেন। কিন্তু এগুলোর অবসান বা ভঙ্গ তাঁর অজ্ঞাত থাকে।

অতঃপর তিনি বুঝতে পারেন যে রূপ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি বিষয় অনুসরণে চিন্তার উৎপত্তি হয় এবং বিষয়ের অভাবে চিন্তা উৎপন্ন হয় না। পর্যবেক্ষণের অন্তরালে অনুমানের ওপর নির্ভর করে তাঁর প্রতীতি হয়—অবিद्या, তৃষ্ণা, কর্ম ইত্যাদি মূল কারণসমূহ বিद्यমান আছে বলে এ নামরূপ বা পঞ্চস্কন্ধ প্রবর্তিত হচ্ছে। এ ভাবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানে নামরূপের হেতু পর্যবেক্ষণ করে জ্ঞানার নাম প্রত্যয় পরিগ্রহ জ্ঞান বা হেতুপরীক্ষণ জ্ঞান। এ জ্ঞান পরিপক্ব হলে অনুকূল হেতু সমূহের দ্বারা প্রবর্তিত নামরূপ দেখে তিনি উপলব্ধি করেন—এ নামরূপ হেতু সমূহের দ্বারা উদ্ভূত এবং প্রবর্তিত; এর মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালক এবং সুখছুঃখাদির অনুভবকারী কোন ব্যক্তি বিশেষ নেই। এরকম জ্ঞানকে ‘কণ্ঠাবিতরণবিশুদ্ধি’ বা সংশয়োত্তরণ বিশুদ্ধি বলে।

সংশয়োত্তরণ বিমুক্তি যখন অধিগত হয়, সাধক পর্যবেক্ষিত বিষয়ের আদি, মধ্য ও অন্তভাগ বিশ্লেষণ করে হৃদয়ঙ্গম করেন। এ অবস্থায় গমনে পা তোলা শেষ হলে পা বাড়ানো, তার পরে পা রাখা—এভাবে পূর্ব ক্রিয়ার অবসানে উত্তর ক্রিয়ার উৎপত্তি তিনি লক্ষ্য করেন। ছুঁখানুভূতি সমূহের মধ্যেও এক স্থানে প্রবর্তমান এক অনুভূতির অবসানে অগ্নস্থানে অন্য এক অনুভূতি অনুভূত হয়। তার ওপর মন নিবিষ্ট করলে সেই অনুভূতি ধীরে ধীরে লঘু থেকে লঘুতর হয়ে বিগত হতে দেখা যায়। মনের গোচরীভূত বিষয়সমূহের মধ্যে পর্যবেক্ষিত এক একটি বিষয় বিগত হলে অন্য একটির উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি বিষয়ের নিরীক্ষণে প্রত্যেকটি, অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে অন্তর্হিত হতে দেখা যায়। এতে সাধক নিত্য, ধ্রুব, অক্ষয় কোন বস্তু খুঁজে পান না। এভাবে নিরীক্ষণের ফলে তিনি বিষয়ের ক্ষয়িষ্ণুতা লক্ষ্য করে বিষয়কে অনিত্য বলে দর্শন করেন এবং তা উৎপন্ন হয়ে ভগ্ন হওয়ায় দুঃখময় বলে ধারণা করেন। আবার তা ইচ্ছানুবর্তী না হয়ে স্বাভাবিক ভাবে উৎপত্তি ভঙ্গ নিয়মের অধীন হয় বলে তাঁর কাছে অনাত্ম বা অহংশু (‘আমি’ ‘আমার’ বলে অগ্রহণীয়) প্রতিভাত হয়। এভাবে বিষয়সমূহের অনিত্যতা, দুঃখময়তা এবং অহংভাবশূন্যতা প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করে জানার নাম প্রত্যক্ষ সংমর্শন জ্ঞান।

এ জ্ঞান আয়ত্ত করে সাধক জগতের সমস্ত নামরূপকে পূর্বোক্ত বিষয় সমূহের মত ভঙ্গুর, দুঃখপূর্ণ এবং অনাত্ম বলে ভাবতে থাকেন। ভঙ্গুরতা, দুঃখপূর্ণতা এবং অনাত্মতা সর্বস্থানের ও সর্বকালের নামরূপের প্রকৃতি বলে তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ তিনি বুঝতে পারেন জগতের সমস্তই ভঙ্গুর বা ধ্বংসপ্রায়ণ, দুঃখপূর্ণ এবং অনাত্ম বা ‘আমি’ ‘আমার’ বলে অগ্রহণীয়। একে ‘অনুমান

সংমর্শন' জ্ঞান বলা হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো উল্লেখযোগ্য :—

সবের সংখ্যার অনিচ্ছাতি যদা পঞ্ঞায় পস্‌সতি  
অথ নিব্বিন্দতি দুক্‌থে এস মগ্‌গো বিমুচ্ছিয়া  
সবের সংখ্যার দুক্‌খাতি যদা পঞ্ঞায় পস্‌সতি  
অথ নিব্বিন্দতি দুক্‌থে এস মগ্‌গো বিমুচ্ছিয়া  
সবের সংখ্যার অনন্তাতি যদা পঞ্ঞায় পস্‌সতি  
অথ নিব্বিন্দতি দুক্‌থে এস মগ্‌গো বিমুচ্ছিয়া।

অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী, দুঃখদিক্‌ বা দুঃখপূর্ণ এবং অনাস্থ বা অহংভাবশূন্য বলে যিনি প্রজ্ঞানের দৃষ্টিতে দর্শন করেন, তিনি দুঃখপূর্ণ সংসারের প্রতি বিরক্ত হন—এটিই বিমুক্তির পথ।

অনিত্যতা, দুঃখময়তা ইত্যাদির বিষয় যোগী যখন নিবিষ্ট মনে ভাবতে ভাবতে বা ধ্যান করতে করতে বর্তমান নামরূপের বা পঞ্চস্কন্ধের ক্ষণস্থায়িত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকৃতি যুগপৎ মনন করতে সক্ষম হন, তখন বিদর্শনের প্রভাবে তাঁর সম্মুখে জ্যোতির স্ফুরণ হয়। এ জ্যোতি কারু কাছে দীপালোকের মত, কারু কাছে বিদ্যুৎ প্রভার মত অথবা কারু কাছে চন্দ্র সূর্যের আলোর মত প্রতিভাত হয়। আবার কারু কাছে ক্ষণস্থায়ী এবং কারু কাছে দীর্ঘস্থায়ী। এ অবস্থায় বিদর্শন সমন্বিত স্মৃতি তাঁর প্রথর হয়ে ওঠে। এর প্রভাবে উৎপন্ন নামরূপ তাঁর ধ্যানপ্রবণ চিত্তে স্থয়ং দেখা দেয়। সেই নামরূপের মধ্যে তাঁর স্মৃতি যেন স্বভাবতঃ মগ্ন হয়ে পড়ে। তখন তাঁর অস্মরণীয় নামরূপ কিছুই নেই বলে প্রতীতি জন্মে। প্রত্যবেক্ষণ শক্তিরূপ ও বিদর্শন প্রজ্ঞান তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এর প্রভাবে তিনি প্রত্যবেক্ষিত সমস্ত নামরূপ বিশ্লেষণ করে সুপরিষ্কৃত ভাবে হৃদয়ঙ্গমও করেন। তখন তাঁর প্রত্যবেক্ষণ শক্তির বাইরে কোন

নামরূপ নেই বলে ধারণা হয়। নামরূপের অনিত্যাদি প্রকৃতি এবং অশ্রু স্বাভাবিক গুণসমূহ প্রত্যবেক্ষণ ক্ষণেই সুপরিষ্কৃত হয়। এ তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে অনুভূতি জাগে। এ অবস্থায় তাঁর মনে বিদর্শনসমন্বিত গভীর আনন্দের উদয় হয়। এতে মন প্রশান্ত ও অনাবিল হয়ে ওঠে এবং বুদ্ধগুণাদি স্মরণে মনের মগ্নতাব বৃদ্ধি পায়। তখন অপরকে উপদেশদান, সংকর্মে নিয়োগ ইত্যাদির জ্ঞান চিন্তের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রীতিতে তাঁর হৃদয় প্লাবিত হতে থাকে। তা চিত্তবিশুদ্ধিকরণ থেকে লোম-হর্ষণ, দেহ-সঞ্চালন ইত্যাদি উৎপাদনে সমস্ত শরীর যেন স্নেহ-মধুর স্পর্শে বিভোর করে পরম সুখানুভূতি জাগিয়ে দেয়। তাতে মনে হয় যেন শরীর, মৃত্তিকা থেকে উদ্গত হয়ে অনন্ত শূন্যে ভেসে চলেছে। তখন দেহমনের সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত করে প্রশান্তি আসে। গমন, স্থিতি, শয়ন, উপবেশন এক কথায় সকল অবস্থায় দেহ মনের ব্যথা বেদনা অবসাদ গ্লানি বলে কিছুই থাকে না। দেহমন প্রশান্ত পরমাশ্বস্ত সরল সক্রিয় হয়। শরীর যেন অন্তহীন সুখ-সমুদ্রে ভাসতে থাকে। তাতে তিনি আপনাকে পরম সুখী ও অননুভূত সুখমগ্ন মনে করে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। আপনার এ অপূর্ব ভাবান্তর লোকের নিকট ব্যক্ত করবার জ্ঞান ইচ্ছা জাগে। এ প্রশান্তি ও প্রীতি সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে—

সুঞ্ঞাগারং পবিট্ঠস্স সন্ত চিত্তস্স ভিক্ষুনো

অমানুসী রতি হোতি সন্মা ধম্মং বিপস্সতো।

অর্থাৎ নির্জন গৃহে প্রবেশ করে শান্ত চিত্ত ভিক্ষু যখন বিদর্শন ভাবনায় রত হন, তখন তিনি দিব্য আনন্দ অনুভব করেন।

## পাঁচ

দিব্য আনন্দ অনুভব করতে করতে সাধনায় অগ্রগতির জন্ম সাধকের বীৰ্য বা উৎসাহ শিথিলতা বা আধিক্য পরিহার করে সমভাবে প্রবর্তিত হয়। পূর্বে তাঁর প্রচেষ্টা কখনো শিথিলতার জন্ম জড়তাগ্রস্ত হওয়ায় এবং কখনো আধিক্য দোষে বিক্ষিপ্তভাবগ্রস্ত হওয়ায় প্রকট বিষয় নিরন্তর প্রত্যবেক্ষণে তিনি অসমর্থ হতেন এবং তাঁর জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কিন্তু এখন সুসমঞ্জস বীৰ্যের প্রভাবে এ দোষ সমূহ অতিক্রম করে যথাপ্রকট বিষয় নিরন্তর অনুধ্যানে তাঁর সামর্থ্য লাভ হয় এবং জ্ঞান পরিস্ফুট হতে থাকে। অনন্তর বিদর্শনসাম্য শক্তিশালী হয়ে প্রকট হয়। এ সাম্য অনুভূতির গুণে নামরূপের অনিত্যতাাদি অনুধ্যানে সমভাবাপন্ন হয়ে নিরন্তর বর্তমান নামরূপ প্রত্যবেক্ষণ করতে পারেন। তখন বিনা চেষ্টায় এ প্রত্যবেক্ষণ স্বভাবতঃই যেন সম্পন্ন হয় এবং অভিনিবেশসাম্য প্রবল হয়ে ওঠে। তাতে ধ্যান বিষয় চিন্তনক্ষেণেই চিন্ত যেন দ্রুত বেগে বিষয়াভিমুখে ধাবমান হয়ে নিবিষ্ট হয়।

জ্যোতি ইত্যাদি গুণ সমন্বিত ধ্যান উপভোগ করে সাধকের হৃদয়ে সূক্ষ্ম আসক্তির উদ্রেক হয়। তিনি একে উপক্লেশ বা মনের মলিনতা বলে জানতে না পেরে ধ্যানসুখরূপে গ্রহণ করেন। তাঁর আনন্দে তিনি ধ্যানসুখরত বলে উল্লসিত হন। তাঁর জ্যোতি-উদ্ভাসিত প্রীতি সুখোৎফুল্ল হৃদয়ে প্রতীতি জাগে—“আমি নিশ্চয়ই অতীন্দ্রিয় মার্গফল বা নির্বানোপলব্ধির স্তর বিশেষ লাভে ধন্য হয়েছি এবং আমার সাধন কর্তব্যের অবশেষ কিছুই নেই।” এরূপ প্রতীতিকে সত্যজ্ঞতার ভাষায় অমার্গে মার্গভ্রম বা অতীন্দ্রিয় অনুপলব্ধিতে অতীন্দ্রিয়-উপলব্ধি ভ্রম বলা হয়। একে মনের উপক্লেশ



বলে। অমার্গে মার্গ ভ্রম না হলেও জ্যোতি ইত্যাদির প্রতি সাধকের অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। তা বিদর্শন সাধনার পক্ষে হিতকর নয়, বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এজ্ঞা এও সাধনার উপক্লেষ মাত্র। তাই উপক্লেষ সমূহের দ্বারা ক্লিষ্ট দ্রুত প্রবর্তমান প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান অপরিণত উদয় ব্যয় জ্ঞান বলে অভিহিত হয়। এতে নামরূপের উদয়ব্যয় বা উৎপত্তি বিলয় সূষ্ঠুভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না। কিন্তু প্রত্যবেক্ষণরত বিচক্ষণ সাধক অনুভব করেন—জ্যোতি ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় সিদ্ধ নয়, এদের আশ্বাদন বিদর্শন সাধনার বিঘ্ন মাত্র; যথাপ্রকট ধ্যান বিষয় প্রত্যবেক্ষণই বিদর্শনের পথ, বিদর্শন ভাবনার করণীয় আমার অসম্পূর্ণ, আমাকে সম্যকভাবে বিদর্শনরত হতে হবে। এভাবে নিজের বিচার শক্তির গুণে অথবা গুরুর যথাযথ নির্দেশ অনুসরণে নিজের সাধনা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। এ জ্ঞানকে সাধকের পরিভাষায় মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি বলে।

সাধনা সম্বন্ধে যথাযথভাবে স্থিরীকৃত হওয়ায় অথবা যথার্থ ধারণার ফলে জ্যোতি ইত্যাদির প্রতি উদাসীন হয়ে তিনি ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাপ্রকট নামরূপ নিরন্তর প্রত্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তাতে জ্যোতি, প্রীতি, প্রশান্তি, সূক্ষ্ম অনুরাগ প্রভৃতি উপক্লেষ সমূহ অতিক্রম করে উদয়ব্যয় জ্ঞান তাঁর মধ্যে প্রবর্তিত হয়। তিনি প্রত্যবেক্ষণ করে দর্শন করেন—ছয় দ্বারে গোচরীভূত বিষয় উৎপন্ন হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, সে সে বিষয় সে সে স্থানেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে নামরূপের উৎপত্তি ও বিলয় প্রত্যক্ষভাবে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন। নিরন্তর উৎপত্তি-বিলয়পর নামরূপ প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে তিনি তার উৎপত্তি ও বিলয়কে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করে জানার জ্ঞান অর্জন করেন। একে উপক্লেষমুক্ত উদয়ব্যয় জ্ঞানদর্শন বলা হয়।

নামরূপের উৎপত্তি ও বিলয় প্রত্যক্ষভাবে নিরন্তর নিরীক্ষণের ফলে যখন তাঁর উদয়ব্যয় জ্ঞান তীক্ষ্ণ, প্রবল এবং পরিপক্ব হয়, তখন তা অতি দ্রুতভাবে মনে উদ্ভিত হয় এবং যেন আত্মদ্বন্দ্বিতা করে নিরন্তর প্রবর্তিত হতে থাকে। নামরূপের ক্রিয়া অতিদ্রুত প্রতিভাত হয়। এ জ্ঞান আরও তীক্ষ্ণতর হলে এবং নামরূপের ক্রিয়া আরও দ্রুততর প্রতিভাত হলে প্রত্যবেক্ষিত নামরূপের উৎপত্তি, স্থিতি ও মধ্যভাগ কিংবা হস্তপদাদি অবয়ব দেখা যায় না, শুধু ‘ক্ষয়’ ‘ব্যয়’ ‘ভঙ্গ’ বলে উক্ত নিরোধই দৃষ্টিগোচর হয়। উদরের উন্নমন বা ওঠা লক্ষ্য করলে তার আদি, মধ্য অথবা উদরাবয়ব প্রতিভাত হয় না, শুধু উন্নমনের সমাপ্তিই লক্ষ্যগোচর হয়। এভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমস্ত ক্রিয়ার ব্যাপারে শুধু ক্রিয়া সমাপ্তিই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন প্রত্যবেক্ষিত নামরূপ সর্বতোভাবে অবিদ্যমান বলে তাঁর প্রতিভাত হয়। এ অবিদ্যমানতার অন্তরালে শুধু নিরোধপরতা বা ক্ষয়শীলতা লক্ষ্য করে তাঁর প্রত্যবেক্ষণ চিন্তা, ধ্যান বিষয়ের সঙ্গে অযুক্ত মনে হয়। তখন তাঁর বিদর্শন ভঙ্গ হয়েছে বলে ভ্রম জন্মে। এ ভ্রম তিনি আত্মস্থ হয়ে বিদূরিত করেন।

পূর্বে তাঁর স্বাভাবিক চিন্তা আকার ইত্যাদি অবলম্বনে নিবিষ্ট হত। এমন কি উদয়ব্যয় জ্ঞান পর্যন্ত ধ্যান নিমিত্ত পরিলক্ষিত হওয়ায় তাঁর চিন্তা প্রকট বিষয়ে রত হত। কিন্তু এখন জ্ঞান পরিপক্ব হওয়ায় সংস্কার সমূহের বিগ্রহরূপ নিমিত্তও দৃষ্ট হয় না। সূক্ষ্মতর বস্তু দর্শনের কথাই বা কি? তেমনি বস্তুর উদয় দৃষ্ট হয় না, শুধু ভঙ্গই পরিলক্ষিত হয়। এতে তাঁর অনভ্যাস্ত চিন্তা প্রথমতঃ ঠাঁই পেতে চায় না বা রমিত হয় না। কিন্তু তাঁকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, এ তাঁর প্রারম্ভিক অমুবিধামাত্র, অভ্যাসের ফলে এ অমুবিধা অতিক্রম করে তাঁর চিন্তা অচিরেই ভঙ্গ বা নিরোধে রমিত

হবেই। এর পর তাঁকে উত্তরোত্তর চেষ্টায় আপনার সাধনার এ নূতন স্তরে নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে।

নিরন্তর চেষ্টায় এ যখন আয়ত্ত হয়, তখন তাঁর প্রত্যবেক্ষিত বিষয় এবং তাকে জানার চিন্তা, এ বিষয়-বিষয়ীদ্বয় ভঙ্গুর ক্ষয়শীল বলে প্রতিভাত হয়। শরীরের উন্নমনমাত্রই মনে হয় যেন উন্নমন ক্রিয়ায় উদ্ভূত রূপগুলো পর পর ভেঙে যাচ্ছে। সে প্রত্যবেক্ষিত রূপ সমূহের সঙ্গে প্রত্যবেক্ষণ-চিন্তেরও ভঙ্গ তিনি উপলব্ধি করেন। তখন তাঁর শরীরের যে যে অংশে প্রত্যবেক্ষণ হয়, সে সে অংশের ক্ষয় লক্ষ্য করতে থাকেন। এর পর স্বতই প্রতীতি হয় যেন প্রত্যবেক্ষণ চিন্তা বিষয়ানুগমন করতে করতে নিরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই যে কোন গোচরীভূত বিষয় ও তদনুগামী চিন্তের ভঙ্গ যথাক্রমে পরিষ্কৃত ভাবে অনুভূত হয়। এ ভাবে ছয়দ্বারে যথাশ্রকট রূপ, শব্দ, ইত্যাদি বিষয় এবং তদনুগামী চিন্তা এ দুইএর ভঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞানই ভঙ্গ জ্ঞান বলে কথিত হয়।

এ ভঙ্গ জ্ঞান পরিপক্ব হলে সকল বিষয় ও বিষয়ীভূত সংস্কার সমূহের ভঙ্গ দেখে ভাবের প্রতি ক্রমশঃ তাঁর ভয়, বিরাগ ইত্যাদি তখন যথাশ্রকট বিষয় এবং তদনুগামী বিদর্শন চিন্তা ও দুইটির ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ দেখে তিনি অনুমান করেন—অতীতেও দেহমন এবং সকল সংস্কার এভাবে ভেঙ্গেছিল, ভবিষ্যতেও এভাবে ভেঙে যাবে এবং এখনো ভেঙ্গে যাচ্ছে। এরকম অনুমানের ফলে যথা শ্রকট বিষয় অনুধ্যানরত সাধকের সমস্ত সৃষ্টি ভয়সঙ্কুল ভীতিপূর্ণ বলে মনে হয়। এভাবে ভয়ঙ্কর বলে জানানই ভয়োপলব্ধি। ভয়জ্ঞান এরই নামান্তর।

এ ভয়জ্ঞানে সমস্ত ভব সংসার ভীতিপূর্ণ মনে হয়। তাঁর

দৃষ্টিতে সৃষ্টির দোষসমূহ প্রতিভাত হতে থাকে। এতে প্রত্যবেক্ষিত বিষয় সমূহ, প্রত্যবেক্ষণ-চিন্তাসমূহ এবং চিন্তিত সকল সংস্কার সমূহ নীরস বিশ্বাদ বলে মনে হয়। একেই বলে আদীনব জ্ঞান।

সংস্কার সমূহের দোষ প্রত্যক্ষ করে বিপদসঙ্কুল সংস্কার সমূহের প্রতি তাঁর চিন্তা অনুরক্ত হয় না। স্বতই তিনি এগুলোর প্রতি উদাসীন হন। এ অবস্থায় তাঁর চিন্তা উদাস নিরুদ্ভম বলে প্রতিভাত হলেও তিনি বিদর্শন পরিত্যাগ করেন না। বরং নিরন্তর বিদর্শনে তাঁর মন রত হয়। বস্তুত উক্ত উদাসীন সাধনার প্রতি বিরাগভাব নয়, পরন্তু সংস্কার সমূহের প্রতি বিরক্তভাব-যুক্ত বিরক্তি জ্ঞান। তখন তাঁর মন কোন প্রকার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে রত হয় না, বিষয়ের স্বাদ গ্রহণ করে না এবং স্বতই নির্বাণ প্রবণ নির্বাণ তৎপর হয়। তাই প্রত্যবেক্ষণের অন্তরালে মনে জাগে—ক্ষণ ভঙ্গুর বিপদ-পূর্ণ সংস্কার সমূহ থেকে নিষ্কৃতিই সুখ।

বিরাগভাব নিয়ে প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে সংস্কার সমূহ থেকে বা সংসারাবর্তন থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা তাঁর অন্তরে জাগ্রত হয়। তদপ্রযুক্ত জ্ঞানকে মুমুক্ষা জ্ঞান বলে। তখন মন থেকে প্রার্থনা স্বতই উথিত হয়—‘আমি যেন শীঘ্রই মুক্তিলাভ করতে পারি, এ সংস্কার সমূহের অতীত তীরে যেন উপনীত হই।’ প্রত্যবেক্ষণ সময়ে তাঁর প্রত্যবেক্ষণ চিন্তা যেন গোচরীভূত বিষয় থেকে পলায়ন পর হয়ে ওঠে।

এ ভাবে মুক্তিকামী হয়ে তিনি মুক্তি লাভের জগু প্রাণ পণ করে সংস্কার সমূহকে প্রত্যবেক্ষণ করেন। নিরন্তর প্রত্যবেক্ষণে সংস্কারসমূহ ক্ষণভঙ্গুর, দুঃখময় এবং অনান্য বলে তাঁর প্রতীতি জন্মে। কিন্তু সংস্কার সমূহের দুঃখ ভাবই বিশেষভাবে পরিচ্ছূট হয় এবং নানা প্রকার দুঃখানুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে। তাই তাঁর সমগ্র

সত্তা বা নামরূপ দুঃখের খনি বলে প্রতিভাত হয়। গমন, স্থিতি, শয়ন, উপবেশন কোন অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ থাকার অসামর্থরূপ দুঃসহতা দেখা দেয়। নিরন্তর অবস্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগে। তা হলেও সাধকের অবস্থান পরিবর্তন বিধেয় নয়। উপবেশন, স্থিতি ইত্যাদি প্রত্যেক অবস্থানে অচঞ্চল হয়ে বিদর্শনরত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ধৈর্য সহকারে বিদর্শনরত হওয়ার ফলে তিনি দুঃসহতা অতিক্রম করেন। তখন বিদর্শন জ্ঞান তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। তাই তাঁর দুঃখানুভূতি লক্ষ্য করতে না করতেই মিলিয়ে যায়। সর্বতোভাবে মিলিয়ে না গেলেও ক্ষণে ক্ষণে তার অবসান প্রতিভাত হয়। নিরুদয় না হয়ে নিরন্তর লক্ষ্য করায় অচিরেই তা নিঃশেষে বিগত হয়। তখন তাঁর অনুভূতি শান্তভাবে ধারণ করে। এ ভাবে বিদর্শন জ্ঞান প্রবল ও পরিষ্কৃত হলেও সাধক আত্মপ্রসাদ লাভ করেন না। বিদর্শন জ্ঞান পরিষ্কৃত হয়নি বলে তাঁর প্রতীতি জাগে। এ প্রতীতিও পরিত্যাগ পূর্বক নিরন্তর ধ্যানরত হতে হবে।

এভাবে নিরন্তর বিদর্শনরত হওয়ার ফলে সাধকের প্রত্যবেক্ষণ পরিষ্কৃত থেকে পরিষ্কৃততর হয়ে প্রবর্তিত হয়। তখন তিনি সকল দুঃখ বেদনা, অবস্থান দুঃসহতা ইত্যাদি অতিক্রম করেন। প্রত্যবেক্ষণও দ্রুততর হয়। তাতে ‘অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম’ এ ত্রিলক্ষণের অগ্রতম পরিষ্কৃতভাবে প্রতিভাত হয়। একেই বলে ‘বলবা পটিসংখ্যান ঞ্জান’ প্রবল প্রতি সংখ্যান জ্ঞান।



## ছয়

প্রতিসংখ্যান জ্ঞান পরিপক্ব হলে যথাপ্রকট নামরূপ সৃষ্টিতে স্বতই তীক্ষ্ণ গতিতে জ্ঞানস্ফুরণ হয়। তখন সংস্কারসমূহকে গোচরীভূত করবার জন্য বা জ্ঞানবার জন্য চেষ্টার কোন প্রয়োজন হয় না। এক একটি বিষয়ের প্রত্যবেক্ষণ শেষ হলে স্বতই প্রত্যবেক্ষণ যোগ্য বিষয় গোচরীভূত হয় এবং প্রত্যবেক্ষণও উপলব্ধ হয়। সাধকের চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই বলে প্রতীতি জাগে। পূর্বে যেমন ভয় জ্ঞানের উৎপত্তি থেকে সংস্কার সমূহের ভঙ্গ দেখে ভীতি, বিরক্তি ও মুমূক্ষা ( অব্যাহতি লাভের ইচ্ছা ) উৎপন্ন হত, এখন তা আর হয় না। দুঃখ বেদনা অনুভূত হ'লেও মনে বিষাদ আসে না, দুঃসহ মনে হয় না। তখন প্রায়ই সাধকের দুঃখ বেদনা সর্বতোভাবে উপশান্ত হয়ে যায়। ভীতিপ্রদ অথবা শোককর বিষয় চিন্তা করলেও ভয় কিংবা শোক জাগে না। এ অববোধস্তরকে সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান বলে।

পূর্বে উদয়ব্যয় জ্ঞানের উৎপত্তিতে বিদর্শনের পরিষ্কৃতভাবের জন্য প্রবল আনন্দ জাগত। কিন্তু সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানে তা আরও পরিষ্কৃততর, শান্ততর, সূক্ষ্মতর হলেও মনস্পন্দনহীন হয়। আনন্দজনক বিষয় চিন্তা করেও তিনি অত্যধিক আনন্দে অভিভূত হন না। ষড়েন্দ্রিয় দ্বারে মনের অনুকূল বা প্রতিকূল যে কোন বিষয় ঘনীভূত হলে, তার প্রতি অনুরাগ কিংবা বিরাগ তাঁর জাগে না। বিষয় সম্বন্ধে শুধু জ্ঞানমাত্রই জন্মে। এটি সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের উপেক্ষণ প্রকৃতি।

বিদর্শন আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা বিদর্শন চিন্তায় মগ্ন হয়। সে থেকে যোগীর চেষ্টার কোন প্রয়োজন হয় না। বিনা

চেষ্টাতেও বিদর্শন অবিচ্ছিন্নভাবে দুই তিন ঘণ্টা কাল ধরে চলতে থাকে। এ ভাবে বিদর্শন যখন স্বয়ংপ্রবর্ত হয়, তখন বাইরের কোন বিষয় তাঁর চিন্ত আকর্ষণ করে না। বাইরের বিষয়ের দিকে ধাবিত হলেও মুহূর্তকালের মধ্যেই তা ফিরে এসে প্রত্যবেক্ষিত বিষয়ে প্রবর্তিত হয়।

নানাগুণবিশিষ্ট উপেক্ষণ জ্ঞানে সংস্কার সমূহকে প্রত্যবেক্ষণ করার ফলে যখন সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান পরিপক্ব তীক্ষ্ণ হয়ে চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন যথাপ্রকট সংস্কার সমূহের ভঙ্গ দর্শনেই অনিত্যতা, দুঃখ ও অনায়াসাব সহজেই প্রতিভাত হয়। এ ত্রিলক্ষণের অন্ত্যতম লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে প্রকাশ পায়। একে বলা হয় উত্থানগামী বিদর্শন। এ আয়ত্ত হলে সাধকের চিন্ত সকল সংস্কারের নিরোধ বলে কথিত নির্বাণের পানে অগ্রসর হয়। তখন সকল সংস্কারের অবসানসূচক উপশান্তি পরিদৃষ্ট হয়। এখানে মিলিন্দ প্রশ্নের উক্তি উল্লেখযোগ্য :—

“তস্মসতং চিন্তং অপরাপরং মনসিকরোতো পবত্তং সমতিক্কমিহা অপবত্তম্নুপত্তো হোতি। অপবত্তম্নুপত্তো মহারাজ সন্মা পটিপন্নো নিব্বাণং সচ্ছিকরোতি।” অর্থাৎ ছয়দ্বারে প্রকট নামরূপ পুঞ্জানু-পুঞ্জরূপে প্রত্যবেক্ষণ করতে করতে যোগীর প্রত্যবেক্ষণ চিন্ত (নদী স্রোতের মত অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবর্তিত বলে) ‘প্রবর্ত’ নামে উক্ত নামরূপ অতিক্রম করে ‘অপ্রবর্ত’ বলে কথিত নামরূপাতীত বা জন্ম মৃত্যুর পারে উপনীত হয়। তখন সাধক যথাযথ ভাবে আত্মনিয়োগ করে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার জন্য উত্তম সাধকের অস্তিম প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান নির্বাণানুকূল বলে অনুলোম জ্ঞান নামে কথিত হয়। তার অব্যবহিত পরে সৃষ্টি বিলয়ের অতীত নির্বাণের ওপর প্রথম

দৃষ্টিপাতের মত যে জ্ঞানোদয় হয়, তা প্রাকৃতজনের গোত্র বা স্তর অতিক্রম করে গোত্রভূজ্ঞান নামে উক্ত হয়। এর পর জ্ঞান যখন নির্বাণস্থ নির্বাণময় হয়, তখন একে বলা হয় মার্গজ্ঞান। জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি এরই নামান্তর। এটিই নির্বাণোপলব্ধির প্রথম স্তর বা শ্রোতাপত্তি-মার্গলাভ। এ নির্বাণাবলম্ব জ্ঞানের অবসানভাগ ফল-জ্ঞান বা শ্রোতাপত্তি ফল নামে কথিত হয়। এর স্থিতিকাল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ—একটি প্রত্যবেক্ষণ চিত্তের প্রবর্তনের মত অতি সামান্যই। এর পরে প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মার্গপ্রত্যবেক্ষণ এরই নামান্তর। নির্বাণময় ভাবের অবস্থিতির স্মরণ ফলপ্রত্যবেক্ষণ সংস্কারসমূহের শূন্যতাবোধ নির্বাণ-প্রত্যবেক্ষণ নামে কথিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধমার্গের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ প্রণিধানযোগ্য :—

“ইমিনা বতাহং মগ্গেন আগতোতি মগ্গং পচ্চবেক্খতি অযং মে আনিসংসো লদ্ধোতি ফলং পচ্চবেক্খতি, অযং মে ধম্মো আরম্মনতো পটবিদ্ধোতি অমতং নিব্বানং পচ্চবেক্খতি।” অর্থাৎ এ মার্গ বা পথ দিয়ে আমি নির্বাণোপলব্ধির স্তরে উপনীত হয়েছি বলে (সাধক) প্রত্যবেক্ষণ করেন, এ অমৃতময় পরিণতি লাভ হয়েছে বলে ফল প্রত্যবেক্ষণ করেন, নির্বাণকে গোচরীভূত করে উপলব্ধি করেছি বলে নির্বাণামৃত প্রত্যবেক্ষণ করেন।

এর পর সাধকের যথাপ্রকট নামরূপ প্রত্যবেক্ষণে তা স্থূলভাবে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানের স্তরে যেভাবে সূক্ষ্মরূপে প্রতিভাত হত, তা হয় না। উদয়ব্যয় জ্ঞানের পুনরুৎপত্তিই এর কারণ। বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না, আৰ্যপুদ্গল বা সত্যদ্রষ্টার বিদর্শনে প্রথমেই উদয়ব্যয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম। কোন কোন সাধকের পূর্বোক্ত মার্গফল জ্ঞান থেকে উত্থানের সময় মার্গফলানুসৃত অপরূপ শ্রদ্ধা-সুখ-প্রীতি-প্রশান্তিতে হৃদয় প্লাবিত



হয়। তাঁর মগ্নতাব এত বৃদ্ধি পায় যে, কিছুই লক্ষ্য করার অবসর থাকে না। স্বতই তাঁর মনে জাগে—পূর্বে কখনো এমন আনন্দ অনুভব করিনি।

অবশেষে তিনি যখন প্রত্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন, তখন প্রথমেই উদয়ব্যয় জ্ঞান আসে। ক্রমশঃ তা উৎকর্ষ লাভ করে অচিরেই সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানে পরিণত হয়। তখন সমাধি পরিপূর্ণ না হলে এ জ্ঞানই পুনঃপুনঃ প্রবর্তিত হতে থাকে। সমাধির পরিপূর্ণতায় আপনার নির্বাণোপলব্ধির উদ্দেশ্য করে বিদর্শনরত হলে স্রোতাপত্তি বা নির্বাণোপলব্ধির প্রথম স্তরের ফল চিন্তা ফল ধ্যানরূপে নির্বাণোপগত হয়। এভাবে ফলধ্যান-মগ্ন হওয়া, তাতে নৈপুণ্য লাভ এবং দীর্ঘস্থিতি সাধকের একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ পরিপূর্ণ হলে তাঁর লোকোত্তর সমাধি লাভ অত্যন্ত সহজ সুগম হয়। কেউ কেউ এ অবস্থায় গমনে ভোজনেও সমাধিস্থ হন। সমাধি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা নির্বাণমগ্ন হয়ে যায়। বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না, স্রোতাপত্তি বা নির্বাণোপলব্ধির প্রথম স্তর লাভের সঙ্গে সঙ্গেই অসত্যানুসরণ, দেহাশ্রবোধ, সংশয় ইত্যাদি চিরতরে বিগত হয়। এতাদৃশ সাধকের পতনের সম্ভাবনা থাকে না। তাঁর উর্ধ্বতরস্তর লাভ অবশ্যস্বাবী। কিন্তু তাঁকে এজন্ম নূতন করে ছয়দ্বারে প্রকট নামরূপের বিদর্শন আরম্ভ করতে হয়। এতে তিনি অনায়াসে নৈপুণ্য লাভ করে নিরন্তর চেষ্টায় সকদাগামিতা বা নির্বাণোপলব্ধির দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হত। তখন কামক্রোধের বন্ধন শিথিল হয়ে আসে। এরপর যথাক্রমে অনাগামিতা ও অহর্ষ বলে কথিত স্তরদ্বয় লাভের জন্য এ বিদর্শনবিধিই প্রযোজ্য। তৃতীয় স্তর অনাগামিতা আয়ত্ত হলে কাম, ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়। চতুর্থস্তর অহর্ষ

লাভ হলে অবশিষ্ট বন্ধন—অহংভাব, ভবাসক্তি ও অবিद्या নিঃশেষে  
হিন্ন হয়ে যায়। সাধক যখন এ স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি হন  
বন্ধনহীন শুদ্ধ মুক্ত পুরুষ। তাঁর নির্বাণোপলব্ধি হয় পরিপূর্ণ। এ  
অবস্থাই বিদর্শন সাধনার চরম লক্ষ্য।

-----

# লেখকের অন্যান্য বই

মহাশান্তি মহাপ্রেম ( তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ )

এতে বুদ্ধের সমগ্র জীবনালেখ্যটি গল্পের মত মনোরম করে চিত্রিত । কয়েকটি অভিমত —  
দেশ : — বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বিদগ্ধ গ্রন্থকার বুদ্ধজীবনের এই কাহিনীগুলি চয়ন করে উপভোগ্য আখ্যায়িকায় নিবদ্ধ করেছেন ।.....

যুগান্তর : — বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পালি সাহিত্যের গভীর অরণ্য থেকে সংগ্রহ করেছেন সুন্দর সুরভিকুসুম ।  
.....

আনন্দবাজার : — আলোচ্য গ্রন্থখানির রচনা-ভঙ্গী প্রাঞ্জল ও সরস, অকপট ও আন্তরিক ।

অখণ্ডসংস্করণ

মূল্য : — ৫০ টাকা

অমৃত ধারা ( দ্বিতীয় সংস্করণ )

সম্বোধির পথে

বিদর্শন যোগ

অন্তর্লোকযাত্রী রবীন্দ্রনাথ

কর্মযোগী কৃপাশরণ

সংযুক্ত নিকায় ( ১ম খণ্ড )

সংযুক্তনিকায় ( ২য় খণ্ড )

সজ্জ সাগ্নিধো

অভিধর্ম দর্পণ

বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা